নমো রামায় রামকৃষ্ণায়

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

আমাদের সনাতন ভক্তিধর্মে শ্রীরামচন্দ্র অবতার। যুগে যুগে তিনি আসেন মানুষকে মনুষ্যজীবনের সার্থকতার পথ দেখাতে। এর আগের মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারে তাঁদের বিনাশী শক্তির প্রকাশই বড়, অন্তত পুরাণে বর্ণিত আখ্যান পড়লে তা-ই মনে হয়। শ্রীরামচন্দ্র রূপে এসে তিনি প্রথম মানুষের সঙ্গে এক নিকট সম্পর্ক—ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ করে দিলেন। সে-ভালবাসায় একটা নিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস আছে। রামায়ণ রচনার পেছনে দস্যু রত্নাকরের কাহিনি, তাঁর বাল্মীকি মুনি হয়ে ওঠা, তাঁর শোকার্ত হয়ে মুখনিঃসৃত অভিশাপ প্রথম ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বলে স্বীকৃতি পাওয়া, এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা আমরা জানি। এইসব ঘটনা এবং ব্রহ্মার নির্দেশে রামচরিত রচনা রামায়ণকে বাল্মীকির কল্পিত কাহিনি বলে আখ্যায়িত হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। তাই রামায়ণ নিছক মহাকাব্য অথবা ইতিহাস, এ নিয়ে বাদানুবাদ বহুকাল ধরে হয়ে আসছে, কিন্তু এখন সূক্ষ্ম যন্ত্রগণকের ব্যবহারে ঐতিহাসিকত্বের দিকে পাল্লা ভারি হয়ে উঠছে। আগে ইতিহাস বলে প্রমাণের যে-যুক্তিগুলি দেওয়া হত, তা বর্তমানে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে। বাল্মীকি অবশ্যই জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাই সমস্ত বিশেষ ঘটনা বর্ণনার সময় তার তিথি, নক্ষত্র, মাস ও বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটনাকে উল্লেখ করতে ভোলেননি। যেসব স্থানে রামচন্দ্র থেকেছেন বা যাওয়া-আসার পথে যেসব স্থান পড়েছে তার নিখুঁত বর্ণনায় সেখানকার বিশিষ্ট নদী, অরণ্য, পশুপাখি কিছুই বাদ যায়নি, যা আজও বহুলাংশে বর্তমান। চিত্রকূট থেকে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত যাত্রায় রামচন্দ্রের বিশ্রামের স্থানে স্থানে মন্দির প্রভৃতিতে তাঁর কাহিনি আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। সর্বোপরি স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও নাম আজও অপরিবর্তিত হয়ে আছে। এখন অতি উচ্চমানের কম্পিউটারের কল্যাণে রামচন্দ্রের জন্মদিন বার করাও সম্ভব হয়েছে। বাল্মীকির বর্ণনা অনুযায়ী রামচন্দ্রের জন্ম চান্দ্র চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে—পুনর্বসু নক্ষত্রে। সেই সময়ে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকররাশি, শনি তুলারাশি, বৃহস্পতি কর্কট-

---

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

রাশি ও বুধ মীনরাশিতে অবস্থান করছে। কর্কট লগ্নে জন্ম, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের পূর্ণদৃষ্টির প্রভাবে। বাল্মীকি লিখেছেন, ''ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতুনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।/ ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥/নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চ-সংস্থেষু পঞ্চসু/গ্রহেষু কর্কটে'' লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ॥'' (আদিকাণ্ড, ১৮।৮-৯)

শুরু হল পিছিয়ে যাওয়ার এক অতি জটিল অঙ্ক। প্রতিটি গ্রহতারার চলন ধরে এইরকম একটা সংস্থাপন সম্ভব হয়েছিল কী না সেটি দেখতে হবে এবং যদি তা হয়েও থাকে তাহলে বাল্মীকি বর্ণিত পরবর্তী ঘটনাগুলির নৈসর্গিক অবস্থানের সঙ্গে তা মিলতে হবে, তবেই সেটির সত্যতা নিরূপিত হবে। অত্যাধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল এই নৈসর্গিক অবস্থানটির সময়। বর্তমান সৌরমাসের হিসাবে ১০ জানুয়ারি, খ্রিস্টপূর্ব ৫১১৪ অব্দে বেলা সাড়ে বারোটা। কিন্তু রামনবমী তো মার্চ-এপ্রিলে হয়। এটির কারণ ক্রান্তীয় সময় সংশোধনে প্রতি বাহাত্তর বছরে একদিন করে সংশোধিত হয়। সেই হিসাবে প্রায় একশোদিন যোগ হয়ে আজকের সৌরমাস মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্রমাস পৌঁছয় জানুয়ারিতে। দু-একটি উল্লেখ করি। দশরথের জন্ম রেবতী নক্ষত্র ও মীনরাশিতে। সেদিন তাঁর নক্ষত্রের ওপর রবি, মঙ্গল ও রাহুর দৃষ্টি। এরকম অবস্থায় রাজার মৃত্যু ঘটে অথবা তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তাই দেরি না করে রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় নির্ধারণ করলেন ওই দিনটিতে (অযোধ্যাকাণ্ড, ২।৪।১৮)। সেই দিনটি বর্তমানে গণনা করে বেরোল ৫ জানুয়ারি, খ্রিস্টপূর্ব ৫০৮৯ অব্দ। তখন রামচন্দ্রের বয়স পঁচিশ এবং সেইদিনই বনবাসের শুরু। বনবাসের তেরো বছরের মাথায় খরদূষণ বধ। সেদিন অমাবস্যা ও সূর্যগ্রহণ এবং মঙ্গল মধ্যস্থলে। সেই দিনটি গণনায় ৭ অক্টোবর, ৫০৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। শুধু তাই নয়, বালিবধ থেকে লঙ্কাবিজয়, এইসব ঘটনারই নৈসর্গিক অবস্থান জন্মসময়ের সঙ্গে মিলে গেল গণনায়। 'ইতি হ আস' বা ইতিহাস মানে এইরূপ ঘটেছিল এবং সেই অর্থে এটি ইতিহাস চিরকালই, মহাকাব্যিক কিছু অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও। পাশ্চাত্য ধারাকে অনুসরণ করলে যিশু বা মহম্মদ কারোরই ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা যায় না। সেক্ষেত্রেও বাইবেল ও কোরানই সম্বল।

এখন প্রশ্ন উঠবে, রামচন্দ্রের চরিত্র বা শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতা কি মানবজাতির যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক নয়? এতদিন আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে এগুলি পৌরাণিক গল্পকাহিনি বলে গৃহীত হলেও তার আবেদন তো কমেনি কখনও! তাই এগুলি পুরাণ না ইতিহাস তার বাদানুবাদ বা বিশ্লেষণের কী দরকার? গোলমালের মালটুকু নিলেই তো হয়! অবশ্যই ঠিক, কিন্তু মানুষ যেহেতু যুক্তিবাদী তাই যাচাই করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার সীমাহীন। যুক্তিহীন বিশ্বাসে তার মন সায় দেয় না। সে-কারণেই তাঁদের যাপিত জীবনের বর্ণনা যদি সত্যি কোনও মানবদেহ আশ্রয় করে হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের জীবন ও উপদেশ মানুষের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়। যে-নিক্তিতে এগুলি কাব্য ছাড়া ইতিহাস হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেনি, সেই নিক্তিতে যিশু ও মহম্মদেরও ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা যায় না। আর সেক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গোলমালের মালটি নেন, কোনও প্রশ্ন উঠতে দেন না। হিন্দুধর্মের সুবিধে এই যে, এ-ধর্মের অবতারেরা কোনও নতুন ধর্ম প্রচার করেন না, তাঁরা সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং অসংখ্য মত-পথের যুগোপযোগী কোনও একটিকে প্রচার করে যান। সনাতন ধর্মের সত্য স্বপ্রকাশ, তাই অপৌরুষেয়। ঋষিদের অন্তরে সে-সত্যের প্রতিভাস ঘটেছিল;

শত যুক্তির বিশ্লেষণ যেখানে গিয়ে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয় সেখানেই সেই সত্যের ঝলক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই প্রশ্নকে এ-ধর্ম ভয় পায় না, তবে প্রশ্নটি যথার্থ জিজ্ঞাসুর পরিপ্রশ্ন হতে হবে।

উপনিষদের ঋষিকে শিষ্য যখন ব্রহ্মকে কোনও বস্তু বা পশুর মতো নির্দিষ্ট করে দেখাতে বা শোনাতে বলছেন, তখন গুরু তাঁকে বলছেন ''শ্রদ্ধাবান হও—অনির্বচনীয়কে বাক্যে নির্দেশ করা যায় না।'' তাই যখন এই ধর্মীয় সত্য কারও জীবনে প্রকাশিত হতে দেখা যায় তখন সকল প্রশ্নের নিরসন ঘটে এবং মানুষও তাঁর প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ বোধ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন আজ সাত হাজার বছর ধরে পূজিত ও আদর্শ বলে গৃহীত হয়ে আসছে।

রামায়ণ অর্থ রামের অয়ন বা চলনপথ, যে-পথের আদর্শ ও অনুসরণ ব্রহ্মার আশীর্বাদে ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে যতদিন এই নদী, পর্বত, সাগর সমন্বিত জগৎসংসার থাকবে। কিন্তু রামচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁকে অনুসরণ করার আপাত কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যাঁরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অর্থে, নামযশে প্রবল উন্নতি করে থাকেন তাঁদেরই আদর্শ করি আমরা। সেদিক দিয়ে বিচার করলে রামচন্দ্রের জীবন বিফলতায় ভরা। রাজ্যাভিষেকের আনন্দের দিনে তাঁর বনবাস হল, এবং তা দীর্ঘ চোদ্দো বছর। সুখে লালিত শরীর তৃণশয্যা, পশুমাংস ও বনজাত কষায় ফলে রক্ষা করার কৃচ্ছ্রতায় কাটতে লাগল। সেখান থেকে এক দুর্দিনে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল লঙ্কাধিপতি রাবণ। বহু পরিশ্রমে তাঁর সন্ধান পেলেও তাঁকে উদ্ধার করতে সমুদ্রে সেতু বানিয়ে লঙ্কাবিজয়ের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হল। সীতা উদ্ধারের পরও শেষরক্ষা হল না। লোকাপবাদের কারণে সীতাকে পরিত্যাগ করলেন যখন সীতা অন্তঃসত্ত্বা, ভাবী বংশধরের জন্ম দিতে চলেছেন। এরপরে শর্ত পালনের জন্যে ছায়াসঙ্গী লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলে লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে দেহ বিসর্জন দিলেন। সেই দুঃখে শ্রীরামের দেহও সরযূতে বিসর্জিত হল। দুঃখে যার শুরু, মহাদুঃখে তার শেষ। এ-দুঃখময় জীবনে শেখার কী আছে?

সনাতন ধর্ম বলে, অবশ্য আছে। জীবনের ঘটনাবলি নয়, যাপিত জীবনের দর্শনই গুরুত্বপূর্ণ। কবিগুরু মাত্র কয়েক পঙ্‌ক্তিতে রামচন্দ্রের জীবন-দর্শনকে তুলে ধরেছেন তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়। বাল্মীকি ব্যাধের হাতে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে হত হতে দেখে ক্ষোভে দুঃখে একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। বাক্যটির ছন্দোময়তা ও সুর দেখে তাঁর নিজেরই অবাক হওয়ার পালা। এমন সময় ব্রহ্মার আবির্ভাব ও উচ্চারিত বাক্যটিকে শ্লোক আখ্যা দিয়ে বাল্মীকিকে এক মহৎ জীবনকাব্য রচনা করতে বলা। কিন্তু কার জীবন? ব্রহ্মার নির্দেশে বাল্মীকি নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—''ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—/কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।/কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,/কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম/ধরেছে সুন্দর কান্তি, মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,/মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,/সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,/কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,/কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম/সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—/কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তার পুণ্য নাম।/নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যায় রঘুপতি রাম'।''

দশরথ রানিদের মধ্যে কৈকেয়ীর প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন, তাই কোনও বিশেষ সময়ে তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী তখন নেননি; এখন রামের রাজ্যাভিষেকের দিন মন্থরার মন্ত্রণায় রামকে এক বরে বনবাসে পাঠিয়ে অপর বরে

ভরতের রাজ্যাভিষেক চাইলেন। রামচন্দ্র নিজ চরিত্রগুণে সকলের এমনকী প্রজাদেরও প্রাণপ্রিয়। তিনি জানেন যে এই ঘটনা সমগ্র রাজ্যে এক প্রবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। পিতা দশরথ এই শোক সহ্য করতে পারবেন কী না খুব সন্দেহ। কিন্তু এর অন্যথা হলে দশরথের কৈকেয়ীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করা হবে। অতএব রাম বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে বনবাসে যেতে তখনই সম্মত হলেন। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করেও শুধুমাত্র দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলে কারও ক্ষমতা ছিল না তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে যায়। যে-অন্যায় তাঁর ওপর হল, শুধু তাঁর ওপরই নয়—সমগ্র প্রজাকুল তাঁর নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হল—সে-অন্যায়ের ক্ষমা তাঁর বীর্যকে লঙ্ঘন করল না। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও দেখি, যেখানে বীর্য মূলত সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক। তাই তাঁর পেশিশক্তির দরকার পড়ছে না। কিন্তু প্রয়োজনে সামান্য হলেও প্রকাশ ঘটেছে। 'ছোট ভটচাজ' পুজোর নামে পাগলামি করেন, অতএব খাজাঞ্চি মশাইয়ের আদেশে দারোয়ান ঠাকুরকে ভবতারিণীর মন্দিরে ঢুকতে বাধা দিল। কিন্তু ঠাকুরের কোমল হাতের এক মুষ্ট্যাঘাতে দারোয়ানের প্রাণে এমন ভয় ঢুকে গেল যে, সে কয়েকদিন প্রবল ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে শেষে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেল।

তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত আসছেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। ঢোকার মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হুংকারকে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিগুণ জোরে হুংকার দিয়ে দাবিয়ে তাঁর সিদ্ধাই নষ্ট করে দিলেন। যাঁর কণ্ঠস্বর অতি কোমল, কোন শক্তিতে তাঁর এই হঠাৎ হুংকার? বাগবাজারের বিখ্যাত গুন্ডা মন্মথ তাঁকে ভয় দেখাতে এসেছিল যোগীন মায়ের ভাইদের পরামর্শে, কিন্তু তাঁর স্পর্শে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর চরণে পড়ে গেল। কিন্তু যখন কালীঘাটের পুরোহিত হালদার মশাই, 'মথুরবাবুকে গুণ করার মন্ত্রটি ছোট ভটচাজ কিছুতেই বলছে না' দেখে রেগে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুটজুতোর লাথি মেরে চলে গেল, তখন মথুরবাবুর কোপে পড়ে তার প্রাণের আশঙ্কা বুঝে তিনি এই কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না। মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমা করার স্বাভাবিক প্রবণতাই তো অবতারের বৈশিষ্ট্য। মানুষের দুর্বলতা স্বাভাবিক, তাকে সবল করে তোলার পথ দেখাতেই তো তাঁদের অবতরণ।

লক্ষ্মণ রামের ছায়াসঙ্গী, তিনি রামের অনুগমন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সীতা সুখে দুঃখে পতির সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার মনে রেখে তাঁর অনুগমন করলেন শত নিষেধ সত্ত্বেও। সুমন্ত্র যখন রথে বনবাসের উদ্দেশ্যে রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে অযোধ্যার সীমা পার করিয়ে দিয়ে আসছেন তখন তাঁদের পিছন পিছন সমগ্র রাজপরিবার, প্রজাকুল ছুটছেন রামচন্দ্রকে হারানোর শোকে। রাজা দশরথ এই শোক সহ্য করতে পারলেন না, বিশেষত নিজেকে রামের বনবাসের জন্য দায়ী ভেবে। রামনাম উচ্চারণ করতে করতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভরত তখন নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে।

রামায়ণ একান্নবর্তী পরিবারের এক চরম আদর্শ। ভরত অযোধ্যায় ফিরে হতবাক। ঈর্ষা-দ্বেষহীন এক রাজপরিবারে তাঁর গর্ভধারিণীর কারণে এতবড় বিপর্যয় ভরত মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ছুটলেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে। দশরথের মৃত্যু ঘটায় কৈকেয়ী তাঁর অপরাধ বুঝতে পেরেছেন, তাই কৌশল্যা, সুমিত্রার সঙ্গে তিনিও চললেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে। রাম জানতেন যে তিনি ভরতের সঙ্গে ফিরে গেলে সমগ্র প্রজাকুল, বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিঋষিরা এবং রাজপরিবারের সকলেই তাঁর অনুপস্থিতির বিপর্যয় কাটিয়ে উঠবেন, কিন্তু ''রঘুকুল রীতি সদা চলি আঈ/ প্রাণ যাঈ বরু বচন ন যাঈ''—রামচন্দ্রের চরিত্রে সুকঠিন ধর্মের নিয়ম মাণিক্যের অঙ্গদের মতো ঘিরে আছে, তাকে লঙ্ঘন

করা তাঁর সাধ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যপ্রীতি আমরা সবাই জানি। সত্যে প্রতিষ্ঠিত পিতা ক্ষুদিরাম থেকেই সত্যের এই 'রঘুকুলরীতি' তাঁদের বংশে চলে আসছে। মিথ্যাচরণ করতে হবে বলে ক্ষুদিরাম অক্লেশে তাঁর বিশাল ভূসম্পত্তি ছেড়ে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। এই সত্যপালনের নীতি শ্রীরামকৃষ্ণের স্নায়ুতে মিশে গিয়েছিল। আর তা এতটাই দৃঢ় ছিল যে, কোথাও যাবেন ভেবে থাকলে, সারাদিনে যদি নাও যাওয়া হয় তবু রাতে বন্ধ ফটকের বাইরে থেকে পা গলিয়ে তাঁকে বলতে হয়, ''আমি এসেছি।'' রামচন্দ্রের সত্যপালনের দৃঢ়তা রামকৃষ্ণে এসে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রামচন্দ্র তেরো বছর বনবাসকালে ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন অনায়াসে। তাঁর সন্তানেচ্ছা জেগেছিল সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে তাঁকে গ্রহণ করার পর ইক্ষ্বাকু বংশের ধারা বজায় রাখতে। শ্রীরামকৃষ্ণের আটমাস স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেও দেহবোধ জাগেনি। তাঁকে কাঙালিদের এঁটো খেতে দেখে হলধারী বলেছিলেন, ''তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!'' উত্তরে তিনি বলেন, ''তবে রে শালা, আমার আবার ছেলেপিলে হবে! তোর গীতা, বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন!'' 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—মুখে বলার সঙ্গে কাজের প্রভেদ তাঁর অসহ্য বোধ হত। শরীরে ও মনে সত্যের এই স্বাভাবিক প্রকাশ অতুলনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, পুরুষ আর প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যত স্ত্রীমূর্তি সব সীতার রূপ, আর যত পুরুষ সব রামের রূপ, এ-দুটি অভেদ। তিনিই সীতার রূপে জীবকে মায়ায় বাঁধেন আবার রামরূপে তাদের মুক্তি দেন। রামচন্দ্রের স্তবে বলা হয়েছে : ''যন্মায়াবশবর্তি-বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা/ যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ''—যাঁর মায়ায় ব্রহ্মা থেকে দেব, অসুর সকলেই মায়ার বাঁধনে মিথ্যা এই জগতকে দড়িতে সাপের মতো সত্যরূপে দেখছে, সেই শক্তিরই অপর রূপ এই মায়াসমুদ্রপারের ভেলা রামচন্দ্ররূপে সকল কারণের কারণ হয়ে অবতীর্ণ, তাঁর পাদপদ্মে প্রণতি জানাই— ''যৎপাদঃ প্লবমিব ভাতি হি ভবাম্বোধেস্তীর্ষাবতাম্/ বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্।'' যিনি সাপ হয়ে কাটেন তিনিই রোজা হয়ে ঝাড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে যেন দিব্যি করে বলছেন যে, তাঁকে তিনি সর্বদা ভবতারিণীর একটি রূপ বলে দেখতে পান। আবার শ্রীমাও ঠাকুরের দেহাবসানে কেঁদে উঠছেন : ''মা কালী গো, তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে গো'' বলে। এ শাস্ত্রের বাণীমাত্র নয়, তাঁদের জীবনে প্রকাশিত সত্য।

অযোধ্যায় ঐশ্বর্যের রাজকুমার, সকলের নয়নের মণি রামচন্দ্র অতি বিনীত, আবার সীতাহরণের পর যাঁর সম্বল বলতে ছোট ভাইটি আর দুজনের দুটি তীরধনুক, তিনি প্রয়োজনে সাগরের জল শুষে নেবার হুংকার দিচ্ছেন। অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণের বিনয় ও দীনতা অপরিমেয়। দর্শনার্থী এক ব্রাহ্মণকে যখন তিনি ভক্তিলাভরূপ মাখন তুলে সংসারে ভেসে থাকতে বলেছেন তখন ব্রাহ্মণ উদ্ধত হয়ে বলছেন, ''মাখন তোলার কথা বলছেন, আপনি তুলেছেন?'' শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত না হয়ে তাঁর যাতে অধ্যাত্মপথে কল্যাণ হয় তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পঞ্চবটীর হঠযোগী ব্রহ্মচারী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তাঁর আফিম ও দুধের অর্থ সংগ্রহের জন্য হাজির হয়েছেন, তখন দেহসর্বস্ব সাধকের সামনে তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। শত হোক হঠযোগী সাধু, তমোগুণী হলেও।

রাজাদের রানির বাহুল্য মান্য প্রথা তখন, কিন্তু রামচন্দ্র সে-পথে হাঁটেননি। সকলে জন্মদুখিনী সীতা বলে, যদিও তিনি দুঃখকে রামচন্দ্রের সঙ্গেই আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু রামের দুঃখ

অবর্ণনীয়। তাঁর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া দুঃখকে তিনি মাথার মুকুট হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। যে-সীতাকে উদ্ধারের জন্য জীবনপণ যুদ্ধ করলেন, তাঁকে উদ্ধারের পর প্রজাদের সন্দেহ দূর করতে আবার তাঁকে অক্লেশে পরিত্যাগ করলেন, সন্তানসম্ভবা সীতার দ্বারা বংশরক্ষা হতে চলেছে জেনেও। অশ্বমেধ যজ্ঞে সোনার সীতার মূর্তি তৈরি করে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন কিন্তু পুনর্বার দারপরিগ্রহ করলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বত্যাগী হয়েও বিবাহ করলেন, সংসারও করলেন তবে তা সাধারণ সংসার নয়, সংসারের এক চরম আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। সে-সংসার ধর্মের সংসার, যেখানে বিষয় উদ্দেশ্য নয়—যেটুকু বিষয় আছে তা ভক্তসেবা, ঈশ্বরসেবার জন্য। সে-সংসারে কারও সঙ্গে মায়িক সম্পর্ক নেই, আছে কেবল ভাবরাজ্যের আত্মিক সম্পর্ক। তা বলে সংসারের দায়ও এড়াননি। স্ত্রীকে চিকিৎসা করিয়েছেন নিজের কাছে রেখে। তাঁকে স্নেহ, ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়ে সংসারের খুঁটিনাটি শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁকে আদ্যাশক্তি দেবী ত্রিপুরসুন্দরীজ্ঞানে পূজা করে জগন্মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্যে অর্থের ব্যবস্থা করে গেছেন। আবার নিজের আরব্ধ জগৎকল্যাণকর্মের দায় সহধর্মিণীকে দিয়ে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠতার পরিপূর্তি ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণে।

শ্রীরামচন্দ্র—যাঁর বনবাসে সম্বল বলতে কিছুই নেই, না লোকবল, না অর্থসম্পদ—তিনি সীতাকে হারিয়ে রাবণের অতুল প্রতাপ ও শক্তির কথা জেনেও সীতা উদ্ধারের নির্ভীক সংকল্প নিলেন। বিপদের মুখোমুখি হওয়ার এই সাহস তাঁর চরিত্রের একটি অত্যুজ্জ্বল দিক। তিনিই আবার অযোধ্যার রাজসম্পদের মধ্যে থেকেও লোকনিন্দায় ভীত; রাজধর্ম পালনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করছেন। ''সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক...।'' শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারির দশ হাজার টাকা তাঁকে প্রণামী হিসাবে দেওয়ার কথা শুনে যেন লাঠির বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। সম্পদে ভয়। আবার তিনিই দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলছেন, এই রোগের ফলে তাঁর অন্তরঙ্গ বাছাই হয়ে গেল। তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুর আলিঙ্গন বেছে নিচ্ছেন। বিপদে নির্ভীক। শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র জীবন সত্যের সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সত্যকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়বদ্ধ ও তাতেই শরীরপাত করে গেছেন। তত্ত্বের সেই সত্যকে জগতে ছড়িয়ে দিতে নরেন্দ্রকে গড়ে তুললেন, আবার ঈশ্বরীয় আনন্দ উপভোগের অনন্ত ভাব অন্যান্য অন্তরঙ্গদের জীবনে বিলিয়ে গেলেন, যাতে কারও অভাব না ঘটে। সংসারীর জন্য রেখে যাওয়া স্বামীজীর মুখ্য ভাবটিকে অবলম্বন করে তাঁদের অন্তরের ভাবটি রামকৃষ্ণ-পার্ষদদের জীবন থেকে পছন্দমতো নিয়ে নিজেকে ঋদ্ধ করতে কোনও অসুবিধে না হয়।

যুগের পর যুগ আসে। প্রয়োজন বদলায়, সেই অনুসারে অবতারও আসেন। চলে নব নব লীলা।

''শ্রীরামায় শ্রীকৃষ্ণায় রামকৃষ্ণায় বেধসে।
রঘুনাথায় কান্তায় সারদাপতয়ে নমঃ॥'' ✠

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীসারদা মঠের চতুর্থ অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা nibodhatapatrika@gmail.com-এ মাতাজী সম্পর্কিত লেখা পাঠাতে পারেন।

—সম্পাদিকা